**ATMADEEP**
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
**ISSN: 2454–1508**
**Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)**
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1211-1217
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
**DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.341**

# পাশ্চাত্য হিতবাদ ও ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় নৈতিক আদর্শ বিবেকানন্দের প্রতিক্রিয়া

**অভিজিৎ গরাই**, *গবেষক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 16.03.2026; Accepted: 17.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Abstract**

To Bengalee, to Indian - even to outsiders, Vivekananda is known as a seer, humanist, and social activist. He is not usually recognised as a philosopher, but rather as 'Swamiji'. However, his writings and lectures are filled with deep philosophical insights. One example of a philosophical argumentative analysis appears in his critique of the supporters of the principle of Utility. The advocates of Utilitarianism, such as Jeremy Bentham and John Stuart Mill, have urged us to abandon belief in supernatural entities, which they regard as mysterious, and to lead an altruistic moral life. By adopting the principle of 'the greatest good for the greatest number,' the claim that one can effectively explain sacrifices and altruism inclination. Swamiji respectfully disagrees with the utilitarians at this point. He argues that ethics cannot be developed without a conviction in the existence of the supernatural or a belief in its infinity. He presented numerous arguments side by side to expose the moral emptiness of the Western 'Hitavada' principle. This paper is a humble attempt to reflect on Swamiji's observations.

**Keywords:** Supernatural, Utilitarianism, 'Hitavada', infinity

বঙ্গমানসে বিবেকানন্দের পরিচয় স্বামীজী হিসেবে। সমাজসেবী, সন্ন্যাসী ও ভারতপ্রেমী হিসেবে তার পরিচয় যতখানি দার্শনিক হিসেবে তার পরিচয় ততখানি নয়। এই কারনেই অনেকেই রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখকে দার্শনিক বলে মেনে নিতে চান না। কিন্তু তার বানী-রচনা ও অভিভাষণ গুলির ছত্রে ছত্রে যে গভীর দর্শন ও মননবোধ সম্পৃক্ত রয়েছে গুণীজন মাত্রই তা জানেন। তবে সরাসরি ভাবে দার্শনিক বিচার তার যে সমস্ত রচনায় পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে একটি হল হিতবাদ বা 'Utility' তত্ত্ব সম্বন্ধে তার প্রতিক্রিয়া। 'Utility' তত্ত্ব দর্শনের ছাত্রের কাছে পরিচিত উপযোগিতাবাদ হিসেবে। প্রয়োজনবাদ হিসেবেও একে কখনো কখনো চিহ্নিত করা হয়। এই উপযোগিতাবাদ বা প্রয়োজনবাদ স্বামীজীর রচনাই 'হিতবাদ' নাম পেয়েছে, এই হিতবাদ যে ভারতীয়ও হিতবাদী ঐতিহ্যের সঙ্গে মানানসই নয় সে কথা অনেকেই বলেছেন। কিন্তু ঠিক কেন সন্তোষজনক দার্শনিক বা নৈতিক মতবাদ হিসেবে গ্রাহ্য নয়। স্বামীজীকে অনুসরণ করে তার ব্যাখ্যা দেওয়া এই উপস্থাপনের অভিমুখ হবে।

হিতবাদ সম্বন্ধে স্বামীজীর বিরূপ মনোভাবের পরিচয় দেওয়ার পূর্বে পাশ্চাত্য হিতবাদের একটা পরিচয় দেওয়া দরকার। সুখ লাভের চেষ্টা মানুষের জন্মগত। অন্যান্য প্রাণীর মত সেইও একটি প্রাণী, স্বাভাবিক ভাবেই আত্মসুখ নিশ্চিত করা তার জীবনে অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। নিজের জৈব চাহিদাগুলির পরিপূরণ তার

চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে তার প্রতিটি আচরণের ক্ষেত্রে কিন্তু অন্য পশুর সঙ্গে মানুষের তফাৎ রয়েছে। জৈব প্রবৃত্তি মানব সত্তার সবটুকু নয়। একটি পশুর সমস্ত আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় তার সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা। কিন্তু, মানুষ বিচারশীল প্রাণী। সহজাত প্রবৃত্তির দাস সে হতে পারে না। কৃত কর্মের অনুশোচনা যেমন তাকে ভাবিত করে তেমনি ভাবি কর্মের দুর্ভাবনা তাকে পীড়িত করে। বিচারশীল এবং মননশীল প্রাণী হিসেবে তার কী করা কর্তব্য, সে প্রশ্ন তার মনে ভিড় করে। এই সম্বন্ধে প্রচলিত নীতি তত্ত্বগুলি পরস্পর বিরোধী সমাধান নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়। একদিকে সুখবাদ বলে, সুখলিপ্সা দ্বারাই তার চালিত হওয়া উচিত অন্যদিকে কর্তব্যবাদ বলে, ক্ষুদ্র সুখের ইচ্ছাই নয়, বিচারশীল প্রাণী হিসেবে কর্তব্যবোধের দ্বারা চালিত হওয়াই মানুষের আদর্শ। এখন এই আত্মপ্রীতির দ্বারা চালিত হয়ে নিজে ইন্দ্রিয়ের দাবী গুলিকে সম্পূর্ণ করার দিকে মানুষ যদি নিয়োজিত হয় তাহলেও কিন্তু সে সুখই হয় না কারণ সে একটা সমাজে বাস করে, সমাজের অন্যদের ভাবনাও ভাবিত করে তাকে। স্বার্থপরের মত নিজের কথাটুকু ভেবে তার কাজ শেষ হতে পারে না। তাই বিচারশীল প্রাণী হিসেবে কি করা উচিত সে প্রশ্ন তাকে তাড়িত করে। এই সম্মন্ধে কর্তব্যবাদীরা একটি ভিন্ন সমাধান নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়। একদিকে আত্মস্বার্থ অন্যদিকে পরস্বার্থ উভয়ইকে রক্ষা করা একটি তৃতীয় পথপ্রস্ত নিয়ে হাজির হন 'Utility' তত্ত্বের প্রবর্তকরা। তারা দাবী করেন, আত্মসুখের কামনার সঙ্গে পরহিতের ঘটনাকে এমনভাবে সংবদ্ধ করা যায় যেখানে নিজের সুখ কামনা করেও একজন ব্যক্তি পরহিতের ইপ্সা করতে পারে। মানুষের উচিত বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা চালিত হওয়া। প্রাণীবৃত্তি তার নিম্নতর বৃত্তি, বুদ্ধি বৃত্তি তার উচ্চতর বৃত্তি। নিম্নতর বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত বা শাসিত করে উচ্চতর বৃত্তির আলোয় পথ চলায় মানুষের কর্তব্য। এই কঠোর কর্তব্যবাদী তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হওয়া তার কাছে সমস্যার হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে স্বার্থপর সুখবাদ অন্যদিকে শুষ্ক কর্তব্যবাদ। এই দুইয়ের দাবীর টানাপোড়েনে সে বিভ্রান্ত হয়। এই পরিস্থিতিতেই ইউরোপে তৃতীয় একটি নৈতিক মতের আবির্ভাব ঘটেছে সেটি হল উপযোগবাদ।

ইংরাজী 'Utility' বা উপযোগ শব্দ থেকে 'Utilitarianism' বা উপযোগবাদ কথাটির উৎপত্তি। উপযোগের ভিত্তিতে কোনো কাজ বা নীতির যথাযথতা নির্ধারণ করে এই মতবাদ। যে কাজের উপযোগ সর্বাধিক, যা সর্বাধিকের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করে-সেই কাজই করণীয় বা উচিত-বলে এই মতবাদ রায় দেয়। ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে বেন্থাম ও জন স্টুয়ার্ট মিলের রচনাকে অবলম্বন করে এই ভাবধারা ইউরোপীয় চিন্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। শুধু ইউরোপ কেন ইংরাজি উপনিবেশ ভারতবর্ষের ইংরেজী শিক্ষিতদের মানসে এই মতবাদ গভীরভাবে দাগ কাটে। চিরাচরিতভাবে হিতবাদীর ঐতিহ্য উত্তরসূরী ভারতীয়রাও ভাবতে শুরু করেন, কোন কাজ হিতকর বা মঙ্গলসাধক আর কোন কাজ অহিতকর বা অনুচিত তা নির্ধারণের মাপকাঠি ঐ কাজের দ্বারা উপযোগ বা কল্যাণের পরিমাণ। অধিকাংশ উপযোগবাদীর কাজে এই কল্যাণ আসলে সুখ বা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি (Pleasure)। উপযোগবাদীদের পরসুখবাদীও বলা হয়; যদিও ব্যতিক্রমী কিছু উপযোগবাদীর কাছে এই উপযোগ সুখ মাত্র নয়। এই প্রসঙ্গে বেন্থামের অভিমত উল্লেখের দাবী রাখে-

> "By utility is meant that property in any object, whereby it tends to produce benefit, advantage, pleasure, good, or happiness."[১]

[১] Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789) Oxford, ch. I, p.2

ঠিক যে পরিমানে একটি কাজ সুখপ্রবণ তো যে সেই পরিমানে যথোচিত স্মরণ করিয়ে দিয়ে মিলও বলেছেন,

> "Actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness. By happiness are intended pleasure and the absence of pain."[২]

অর্থাৎ কিনা কল্যাণ (good) এর অন্তরালে সর্বাধিক সংখ্যকে সর্বাধিক পরিমানে সুখই তাদের কাছে কাম্য। এর জন্য উপযোগবাদীদের পরসুখবাদী বলে অভিহিত করা হয়; যদিও উপযোগকে সুখের সঙ্গে এক করে ফেলতে রাজি নন। এমন কিছু ব্যতিক্রমি উপযোগবাদীও রয়েছেন। তবে উপযোগ সুখ হোক বা না হোক "Greatest good of the greatest number" হল নির্বিশেষে সকল উপযোগবাদীর সাধারণ নীতি।

এই পর্যন্ত পাশ্চাত্য হিতবাদীদের নীতিদর্শনের একটা পরিচয় পাওয়া গেল। এও জানা গেল যে নৈতিক মানদণ্ড গ্রহণ করলে শুধুমাত্র বিচারবুদ্ধির দ্বারাই নৈতিকতার ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে, কোনো অলৌকিক সত্ত্বা বা কোনো অলৌকিক শক্তির অনুমোদন স্বীকার করার প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠে যে একজন ব্যক্তি কী কারণে নিজের ভালো বা কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের কল্যাণের কথা বিবেচনা করবে? অর্থাৎ কোন ব্যক্তি স্বরূপত আত্মসুখবাদী বা অহংবাদী, অহংবাদী এক ব্যাক্তি কীভাবে পরবাদীতে রূপান্তরিত হবে? এই বিষয়ে বেন্থাম ও মিলের ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন। বেন্থামের মতানুসারে, মানুষ যদিও স্বভাবত আত্মসুখ কামনা করে তথাপি সে পরবাদী হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু কীভাবে হবে? এর মূল বা কারণ হিসেবে তিনি চার প্রকার নিয়ন্ত্রনের কথা বলেছেন- ১. প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ ২. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ৩. ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ ও ৪. রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ।

মানুষ যেহেতু সমাজে বাস করে তাই বাকি মানুষদের সাথে সম্বন্ধ নির্মাণ করেই তাকে থাকতে হয় এবং সমাজের দাবিও তাকে মেনে চলতে হয়, যাকে বেন্থাম সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলে গণ্য করেন। আবার মানুষ প্রকৃতির অপর নির্ভরশীল তাই তাকে প্রকৃতির দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হতে হয়, যেমন প্রকৃতির বিপদ আপদ মোকাবিলা করতে গেলে তাকে অন্যের সাহায্য যেমন নিতে হয় ঠিক তেমনি অন্যের সাহায্যে হাতও বাড়াতে হয়, যা প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রানাধীন। আবার ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ এই মত প্রকাশ করে যে, অন্যের জন্য কিছু করা উচিৎ। আবার রাষ্ট্র স্বার্থপর মানুষকে শাস্তি দেয় ও নিয়ন্ত্রণ করে যাকে বেন্থাম প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এই চতুর্বিধ নিয়ন্ত্রণ থাকার কারণেই মানুষ আত্মবাদী থেকে পরবাদী হতে শেখে। মিল অবশ্য এই বাহ্যনিয়ন্ত্রণগুলিকে পরার্থপ্রবৃত্তির প্রণোদন বলে দাবী করেন নি, কারন শুধুমাত্র নিজের সুখের কারণে মানুষ পরের ভাবনায় ভাবিত হবে এটা মানুষের মর্যাদার পক্ষে হানীকার বলে তিনি বিশ্বাস করতেন, একটি সুখী শূকর হওয়ার চেয়ে অসুখী মানুষ হওয়া গর্বের বলে মনে হতো।[৩] তাই বাহ্য নিয়ন্ত্রণ মানার সাথে সাথে আন্তর নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করার পক্ষপাতী।[৪]

কিন্তু এই হিতবাদ বিবেকানন্দের বিচারে কোনো নৈতিক মতবাদ হিসেবে গণ্য হতে পারে না, কারণ এই মতবাদ আমাদের অলৌকিক বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে বলে অথচ কোনো একটি আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া নৈতিক আচরণ সম্ভব হয় কি? স্বামীজীর মতে, "অহংকারের পূর্ণ বিনাশই নীতিশাস্ত্রের আদর্শ।"[৫] অহংকার

---

[২] J.S. Mill, Utilitarinism (1863) ch.II, P. 9-10.

[৩] J.S. Mill, Utilitarinism (1863) ch.II, P.14.

[৪] Ibid, Ch. III, P. 40-41.

[৫] স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৪।

বলতে তিনি অহংবোধকে বুঝিয়েছেন অর্থাৎ স্বার্থবোধ। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ স্বার্থবোধ ত্যাগ করতে পারছে ততক্ষন পর্যন্ত সে নৈতিক আচরণ করতে পারে না। নীতি শাস্ত্রের মূল মন্ত্রই হল- "নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।"[৬] এখন এই নৈতিক আত্মত্যাগ বা স্বার্থবিলোপ মানুষ করবে কেন? বিবেকানন্দের মতে, কোন অতিচেতন বা কোন আদর্শকে সামনে না রেখে মানুষ আত্মত্যাগেকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না, সহজ কথায় মানুষের যদি কোন অলৌকিক সত্ত্বায় বিশ্বাস না থাকে তাহলে কি কারনে বা কি উদ্দেশ্যে সে অন্যের জন্য ভাবিত হবে? এই প্রসঙ্গে, বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে অনন্তকে পাওয়ার মহতিবাসনা ছাড়া অহংবোধের নাশ হয় না, আত্মত্যাগের প্রবৃত্তি জন্মে না। সুতরাং নীতিশাস্ত্র এবং নৈতিক কর্মের মূলে রয়েছে আদর্শে বিশ্বাস, অতিচেতনের অনুভূতি। এই প্রত্যয় ব্যক্ত করতে গিয়ে স্বামীজি বলেন,

> "অলৌকিক অনুমোদন অথবা আমি যাহাকে অতিচেতন অনুভূতি বলিতে পছন্দ করি,তাহা ব্যতীত কোন নীতিশাস্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারে না। অনন্তের অভিমুখে অভিযান ব্যতীত কোন আদর্শই দাঁড়াইতে পারে না।"[৭]

একই প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে তার লন্ডনের বক্তৃতায়-

> "Without the struggle towards the Infinite there can be no ideal."[৮]

অর্থাৎ অনন্তের অভিমুখের অভিযান ছাড়া কোনো আদর্শ দাঁড়াতে পারে না। অথচ ঐ অনন্তের অভিমুখে অভিযানকেই ত্যাগ করতে বলেন হিতবাদিরা। কারণ তাদের বিচারে ঐ প্রচেষ্টা অসাধ্য ও অযৌক্তিক। অথচ তারাই আবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নীতি অনুসরণ ও সমাজ কল্যাণে আত্ম নিয়োগে করতে বলেন। এখানে বিবেকানন্দের প্রশ্ন, আমরা সমাজ কল্যানে আত্মনিয়োগ করব কেন? অর্থাৎ পরকল্যানে আত্মনিয়োগে প্রণোদন কী হবে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য-

> "হিত করা তো গৌণ ব্যাপার। আমাদের একটি আদর্শ থাকা আবশ্যক। নীতিশাস্ত্র তো লক্ষ্য নয়, উহা উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। লক্ষ্যই যদি না থাকে, তবে আমরা নীতিপরায়ণ হইব কেন?"[৯]

এখানে কেউ প্রতিবাদ করে কান্টের আদর্শের কথা বলতে পারেন, কর্তব্যবোধের যে কঠোর আদর্শ কান্ট প্রচার করেন তার উৎস মূল হল প্রজ্ঞা বা বিশুদ্ধ বুদ্ধি (pure reason) এবং সদিচ্ছা (Good will)। বিশুদ্ধ বুদ্ধির পথে যিনি চালিত হন বিবেকের নির্দেশে তিনি অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেন তুচ্ছ হৃদয়া বৃত্তির কোনো আবেদন তার কাছে থাকে না। তাই ঈশ্বরের ভক্তি অলৌকিক বিশ্বাস নৈতিকতার আবশ্যিক পূর্বাঙ্গ এমনটা বলা যাবে কীভাবে? এই রকম আশঙ্কার উত্তরে বলা যায়, কর্তব্যর জন্য কর্তব্য ও সদিচ্ছা মহান আদর্শের কথা কান্ট বললেও নৈতিকতার তিনটি পূর্বাঙ্গকে (postulates) তিনি স্বীকার করেন; যার মধ্যে আত্মার অমরতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতার পাশাপাশি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। আবার খ্রিস্ট প্রভৃতি সাবেকি ধর্ম গুলি মনে করে যে, সকলেই ঈশ্বরের সন্তান অতএব আমাদের সকলকেই ভ্রাতা ভগ্নী হিসেবে গ্রহণ করা

---

[৬] তদেব. পৃ. ১২৪।

[৭] তদেব. পৃ. ১২৪।

[৮] Swami Vivekananda, The Complete Works of Swami Vivekananda, Volume II – Jnana-Yoga (The Necessity of Religion), 14th Edition, Advaita Ashrama. P.63.

[৯] স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৪-১২৫।

কর্তব্য। অতএব কোন একটি আদর্শকে সামনে না রেখে বা কোনো অতিলৌকিক সত্ত্বার ওপর বিশ্বাস না রেখে নৈতিক কর্মের কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া যায় এমন দাবী করা কঠিন।

শুধু বৌদ্ধিক নৈতিকতার আদর্শ প্রচার করে বলে নয়, পাশ্চাত্য হিতবাদ বিবেকানন্দের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি নানা কারনে। তার প্রথম অভিযোগ, কোনো মানুষের হিত বা সুখই যদি লক্ষ্য হয় তাহলে সে স্বভাবতই আত্মহিতে ব্রতি হবে সে পরহিতে ব্রতি হবে কেন? যে ব্যাক্তি স্বভাবতই সুখ কামনা করে, সে পরসুখ বিধান করতে যাবে কেন? সে পরের জন্য আত্মত্যাগ করবে কেন? কেনই বা নিজেকে দুঃখী করবে? কেন সে নিজেকে সুখী করবে না? এই হিতবাদের বিরুদ্ধে এই সকল প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন বিবেকানন্দ। তাঁর জিজ্ঞাসা,

> "Why should I do good to other men, and not injure them? If happiness is the goal of mankind, why should I not make myself happy and others unhappy? What prevents me?"[10]

এখানে বাহ্য নিয়ন্ত্রণ ও আন্তর নিয়ন্ত্রনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে পারেন Utility পন্থীরা। কিন্তু সমাজ, প্রকৃতি, রাষ্ট্র, ধর্মের চাপ আত্মবাদীকে পরবাদী করে এই যুক্তি ধোপে টেকে না, কারণ পরিস্থিতির চাপে যে পরের কথা ভাবতে বাধ্য হয়, সুযোগ পেলেই সে স্বার্থের সিদ্ধির পথে যাবে একথা ঠিক যে মিল এখানে আন্তর নিয়ন্ত্রনের কথাও বলেছেন। কিন্তু এই আন্তর নিয়ন্ত্রনের নিয়ন্ত্রক কী হবে? কোন বাধ্যতা অন্তরের দিক থেকে মানুষকে পর ভাবনায় ভাবিত করবে, বিচিত্র বহুকে অসীম অনন্ত একের মধ্যে বিধৃত করতে না পারলে– একের দিক থেকে বহুকে দেখতে না পারলে- অন্তরের তাগিদ আসবে কোথা থেকে? হিতবাদিরা সর্বাধিক কল্যানের কথা বলেন, কিন্তু কোনটা কল্যাণ বা হিত এবং কীসের বিচারে তা কল্যানের তা না জেনে তার সর্বাধিকীকরণ সম্ভব কী? মোট কথা কোনো আদর্শকে পূর্বস্বীকার্য হিসেবে মেনে না নিয়ে শুভত্ব বা কল্যাণের ধারনা গড়ে উঠতে পারে না; সে ক্ষেত্রে কল্যানের সর্বাধিকীকরণের প্রয়াস সুদূর পরাহত হয়।

স্বামীজির আরও দাবী, হিতবাদিরা যে মানদণ্ডে শুভের ব্যখ্যা দিতে চান তা আসলে প্রয়োজনের মানদণ্ড, উপযোগের মানদণ্ড, যার নিরিখে সর্বকালের নৈতিক নিয়ম গড়ে উঠতে পারে না। পুনরায় তিনি এই কথাও বলেন, যা কিছু বর্তমান প্রয়োজন পূরণে সহায়ক, আগামীতে তা নাও থাকতে পারে। তাছাড়া প্রয়োজনের কোন চিরায়ত মাপকাঠি নেই। এক সময় যে সমস্ত বিষয় আমাদের প্রয়োজন সাধক বলে মনে হত এখন তাদের অনেক কিছুই হয় বিনষ্ট কিম্বা আর প্রয়োজনের বলে বিবেচিত হয় না। পরিচ্ছদের ধরনে আমূল পরিবর্তনের দিকে নজর রাখলে ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়। একটি বিষয় গোষ্ঠী বিশেষের কাছে কাঙ্ক্ষিত ও সুখকর বলে মনে হলেও ও অন্য ব্যাক্তির কাছে সেটি দুঃখের বলে গণ্য হতে দেখা যায় অর্থাৎ রুচি পছন্দভেদে সুখ ও দুঃখবোধ ভিন্ন ভিন্ন হয়। আমরা যাকে সমাজ বলছি তা সাময়িক, স্বামীজির কথায়,

> "বহুযুগ পূর্বে সমাজের অস্তিত্ব ছিল না, খুব সম্ভব বহুযুগ পরেও থাকিবে না। খুব সম্ভব উচ্চতর ক্রমবিকাশের দিকে অগ্রসর হইবার পথে এই সমাজ-ব্যবস্থা আমাদের অন্যতম সোপান। শুধু সমাজ-ব্যবস্থা হইতে গৃহীত কোন বিধিই চিরন্তন হইতে পারে না এবং সমগ্র মানব-প্রকৃতির পক্ষে পর্যাপ্ত হইতে পারে না।"[১১]

---

[১০] Swami Vivekananda, The Complete Works of Swami Vivekananda, Volume II – Jnana-Yoga (The Necessity of Religion), 14th Edition, Advaita Ashrama.p. 63-64.

[১১] স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৫।

এখানে বলা দরকার সুখবাদীরা যখন "the greatest good of the greatest number" এর কথা বলেন তখন 'good' বা কল্যাণের ধারনা বলতে তারা বর্তমানের সুখবোধকেই প্রাধান্য দেন। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে মানুষের মধ্যেও সুখ লাভ করার নানাবিধ পর্যায় রয়েছে। একদল আছেন যারা স্থূল সুখভোগ করেই তৃপ্তি অনুভব করেন আবার অনেক উচ্চতর মানসিকতার মানুষ আছেন যারা ত্যাগে বা সর্বজনের সুখে আনন্দ লাভ করেন। মানসিক তৃপ্তি, ইন্দ্রিয় সুখ এক নয়। প্রসঙ্গত বলা দরকার, যাকে মোক্ষ বা মুক্তি বলা হয়, তাও একধরণের উচ্চতর সুখই। সুখ আসলে মুক্তির একটি উচ্চতর অবস্থা মাত্র। জীবের ক্রম ভেদে সুখবোধের যে পরিবর্তন তা সর্বজনবিদিত। বিষয়টিকে সহজবোধ্য করতে গিয়ে স্বামীজি, মনুষ্যেতর প্রাণীর খাদ্য গ্রহণের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একটি কুকুর বা শৃগালের দিকে তাকালে মনে হয় জগতের সমস্ত সুখ খাদ্য গ্রহণের মধ্যেই নিহিত, কিন্তু উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রে বা মানুষের ক্ষেত্রে খাদ্য গ্রহণ বা রসনার সাধটায় তার কাছে শ্রেষ্ঠ সুখ নয়। বিশেষত যারা চেতনার উচ্চক্রমে উন্নীত হতে পেরেছেন তা তাদের সুখবোধ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকে অতিক্রম করে যায়।

কাজেই, নীতিতত্ত্ব হিসাবে হিতবাদের দুর্বলতা স্পষ্টতা সত্ত্বেও এর মধ্যে যে লোকহিতের মহৎ আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে তা যেই হিতবাদী মহৎ ব্যক্তির চিন্তার ফসল সে কথা অস্বীকার করেন নি বিবেকানন্দ। তবে কিনা ঐ লোকহিতের প্রেরণাটি স্বামীজির মতে, আধ্যাত্মিক তা ধর্ম থেকেই উৎসারিত। এই বিষয়ে তাঁর মন্তব্য দিয়েই এই নিবন্ধ শেষ করা যাক-

> "কেবল হিতবাদ অবলম্বন করিলেই মানুষ খুব সৎ ও নীতিপরায়ণ হইতে পারে, ইহা আমি অস্বীকার করি না। এ জগতে এমন বহু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা হিতবাদ অনুসরণ করিয়াও সম্পূর্ণ নির্দোষ, নীতিপরায়ন এবং সরল ছিলেন। কিন্তু যে-সকল মহামানব বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের স্রষ্টা, যাঁহারা জগতে যেন চৌম্বকশক্তিরাশি সঞ্চারিত করেন, যাঁহাদের শক্তি শত সহস্র ব্যক্তির উপর কাজ করে, যাঁহাদের জীবন আধ্যাত্মিক অগ্নি প্রজ্বলিত করে, এরূপ মহাপুরুষদের মধ্যে আমরা সর্বদা অধ্যাত্মশক্তির প্রেরনা দেখিতে পাই। তাঁহাদের প্রেরণা-শক্তি ধর্ম হইতে আসিয়াছে। যে অনন্ত শক্তিতে মানুষের জন্মগত অধিকার, যাহা তাহার প্রকৃতিগত, তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য ধর্ম সর্বাপেক্ষা বেশী প্রেরণা দেয়। চরিত্র-গঠনে, সৎ ও মহৎ কার্য-সম্পাদনে, নিজের ও অপরের জীবনে শান্তিস্থাপনে ধর্মই সর্বোচ্চ প্রেরণাশক্তি।"[১২]

[১২] তদেব. পৃ. ১২৮।

**গ্রন্থপঞ্জি:**

১। Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Oxford, 1789.

২। J.S. Mill, Utilitarinism, London: Parker, Son, and Bourn, 1863.

৩। Sinha Jadunath, A Manual of Ethics, New Central Book Agency (P) Ltd, 1978.

৪। Frankena, William K, Ethics, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1963.

৫। OLiver A. Johnson, Rightness and Goodness,Martinus Nijhoff, The Hague.1959.

৬। চক্রবর্তী, সোমনাথ, কথায় কর্মে এথিকস, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।

৭। Chatterjee, P.Bhushan , Published by the Authors, Kolkata, 1966.

৮। স্বামী বিবেকানন্দ, বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬৭ সন।

৯। Swami Vivekananda, The Complete Works of Swami Vivekananda, Volume II, Edition 14th, Advaita Ashrama, 1958.